بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ আগস্ট, ২০১৯ মোতাবেক ৩০ যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমি প্রথমে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত উতবা বিন মাসঊদ হুযাল্লী (রা.)। হযরত উতবা বিন মাসঊদ হুযাল্লীর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। তিনি বনু মাখযুম গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত উতবা বিন মাসঊদ বনু যোহরা গোত্রের মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল মাসঊদ বিন গাফেল এবং তার মায়ের নাম ছিল উম্মে আব্দ বিনতে আবদে উদ্দ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তার আপন ভাই ছিলেন। তিনি মক্কায় প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। ইথিওপিয়া অভিমুখে দ্বিতীয়বার হিজরতকারীদের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উতবা বিন মাসঊদ আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুফ্ফা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিতভাবে যা লিখেছেন তা হলো-

মসজিদের এক প্রান্তে ছাদ দেয়া একটি চাতাল বানানো হয়েছিল যাকে সুফ্ফা বলা হতো। এটি সেসব দরিদ্র মুহাজেরদের জন্য ছিল যারা গৃহহীন ছিলেন। তাদের কোন ঘর ছিল না। তারা সেখানেই থাকতেন আর আসহাবে সুফ্ফা আখ্যায়িত হতেন। তাদের কাজ ছিল মূলত দিবারাত্র মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে অবস্থান করা, ইবাদত করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা। তাদের জীবিকার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। মহানবী (সা.) স্বয়ং তাদের দেখাশুনা করতেন আর যখনই তাঁর (সা.) কাছে কোন উপহার ইত্যাদি আসতো অথবা বাড়িতে কিছু থাকতো, তাতে তাদের জন্য অংশ অবশ্যই রাখতেন। বরং অনেক সময় তিনি (সা.) স্বয়ং অনাহারে থাকতেন আর বাড়িতে যা কিছু থাকতো তা সুফ্ফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আনসাররাও তাদের আতিথ্যে যথাসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন আর তাদের জন্য খেজুরের গুচ্ছ এনে মসজিদে ঝুলিয়ে দিতেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের অবস্থা অসচ্ছলই থাকতো আর অনেক সময় উপবাস থাকার মতো অবস্থা দেখা দিতো এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মদিনা সম্প্রসারণের কারণে তাদের কিছুটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, ফলে কিছু না কিছু পারিশ্রমিক তারা পেয়ে যেতেন আর জাতীয় বাইতুল মাল থেকেও তাদের কিছুটা সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

যাহোক, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র আরো কিছু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তা হলো, তারা দিনের বেলা মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং বিভিন্ন হাদীস শুনতেন আর রাতের বেলা একটি চাতালে শুয়ে থাকতেন। আরবী ভাষায় চাতালকে সুফ্ফা বলা হয়, আর এ কারণেই সেসব বুযূর্গকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বলা হয়। তাদের মধ্যে কারো কাছে চাদর এবং লুঙ্গি এই দু'টো জিনিস একত্রে কখনোই ছিল না। তারা চাদরকে গলার সাথে এমনভাবে বেঁধে নিতেন যে তা উরু পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। পুরো শরীর ঢাকতে সেই কাপড় যথেষ্ট ছিল না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সেসব বুযূর্গদেরই একজন ছিলেন।

তার বর্ণনা হলো, আমি সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্য হতে সত্তরজনকে দেখেছি যে, তাদের (পরনের) কাপড় তাদের উরু পর্যন্তও পৌঁছত না। অর্থাৎ শরীরে যে কাপড় তারা পরিধান করতেন তা বহু কষ্টে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছত। এরপর বলেন, তাদের জীবনজীবিকার যে ব্যবস্থা ছিল তা হলো, তাদের মধ্য হতে এক দল দিনের বেলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতো আর তা বিক্রি করে নিজ ভাইদের জন্য কিছুটা আহারের সংস্থান করতেন। অধিকাংশ সময় আনসারগণ খেজুরের গুচ্ছ এনে মসজিদের ছাউনির সাথে ঝুলিয়ে দিতেন। বাহিরের লোকেরা এসে তাদেরকে দেখে মনে করতো যে, এরা হলো উন্মাদ এবং নির্বোধ লোক, অকারণে এখানে বসে আছে। অথবা তারা হয়ত এটিও মনে করতো যে, এরা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় এতটাই উন্মাদ যে, তারা তাঁর (সা.) দ্বার পরিত্যাগ করতে চায় না। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর কাছে কোন স্থান থেকে সদকা এলে তিনি (সা.) তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর যখন দাওয়াতের খাবার আসতো তখন তাদেরকে ডেকে নিতেন এবং তাদের সাথে বসে আহার করতেন। অধিকাংশ সময়, রাতের বেলা মহানবী (সা.) তাদেরকে মুহাজের এবং আনসারদের মাঝে ভাগ করে দিতেন, অর্থাৎ নির্দেশ হতো যে, নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন একজন বা দু'জন করে অতিথি নিজের সাথে নিয়ে যান আর তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়ান। অর্থাৎ কোন সময় মুহাজেরদের সাথে কাউকে দিয়ে দিতেন, কাউকে আনসারদের কাছে সোপর্দ করতেন যে, এদেরকে রাতের আহার করাতে হবে।

একজন সাহাবী ছিলেন, হযরত সাদ বিন উবাদা, যিনি অত্যন্ত বদান্যশীল ও সম্পদশালী ছিলেন। তিনি কখনো কখনো আশিজন অতিথিকে নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। একত্রে আশিজন পর্যন্ত অতিথি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে রাতের আহার করাতেন। তার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে বা কতেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সুফ্‌ফাবাসীদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। নূন্যতম বারোজন, আর এটিও বলা হয় যে, সর্বোচ্চ একই সময়ে তিনশ' (সাহাবী) সুফ্‌ফা'তে অবস্থান করেছেন, বরং এক রেওয়ায়েতে তাদের মোট সংখ্যা ছয়শ' সাহাবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি (সা.) তাদের সাথে মসজিদে উপবেশন করতেন, তাদের সাথে আহার করতেন আর মানুষকে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। অর্থাৎ এমন নয় যে, তারা বসে থাকে এবং বেকার বা কাজকর্মহীন তাই তাদের সম্মান করা হবে না, তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হবে না, বরং মহানবী (সা.) বলতেন, এরা আমার জন্য, আমার কথাবার্তা শোনার জন্য বসে (থাকে), তাই প্রত্যেকের যথাযথভাবে তাদের সম্মানও করা উচিত এবং শ্রদ্ধাও করা উচিত। একদা সুফ্‌ফাবাসীদের একটি দল মহানবী (সা.)-এর দরবারে অনুযোগ করে যে, খেজুর আমাদের উদরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আহারের জন্য শুধু খেজুরই পাওয়া যায় আর কিছু পাওয়া যায় না।

মহানবী (সা.) তাদের অভিযোগ শুনে তাদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি (সা.) বলেন, এটি কেমন কথা যে, তোমরা বলছ, খেজুর তোমাদের পেটকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তোমরা কি জান না যে, খেজুরই মদিনাবাসীদের খাদ্য। কিন্তু মানুষ এর মাধ্যমেই আমাদের সাহায্যও করে থাকে। আর আমরাও সেগুলোর মাধ্যমেই তোমাদের সহায়তা করি। অতঃপর তিনি বলেন, খোদার কসম, এক বা দুই মাস যাবৎ আল্লাহ্‌র রসূলের ঘরে আগুন জ্বলে নি; অর্থাৎ আমিও এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও

শুধু পানি এবং খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছি। যাহোক, এই আসহাবে সুফ্‌ফা বা সুফ্‌ফার সাহাবীগণ অদ্ভুত নিবেদিত প্রাণ মানুষ ছিলেন। খেজুর খাওয়ার উল্লেখ করে অভিযোগ করেছেন ঠিকই যে, এটি তাদের পেটকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই স্থান পরিত্যাগ করেন নি। তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সেখানেই বসে থাকতেন। আর সেই একই উপায়ে অর্থাৎ অভুক্ত থেকে অথবা খেজুর খেয়ে কিংবা যা-ই পাওয়া যেত তা খেয়েই দিনাতিপাত করতেন। এরপর লেখা হয়েছে যে, এই বুযুর্গদের কর্মব্যস্ততা যা ছিল তা হলো, রাতে সাধারণত তারা ইবাদত করতেন আর কুরআন পাঠ করতেন। তাদের জন্য একজন শিক্ষক নির্ধারিত ছিল, রাতের বেলা যার কাছে গিয়ে তারা পড়তেন। যারা পড়তে জানতেন না বা পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে পড়তে জানতেন না অথবা মুখস্থ করতে চাইতেন হয়ত, তাই একজন শিক্ষক রাতে তাদেরকে পড়াতেন। এই কারণে তাদের অধিকাংশকে ক্বারী বলা হতো আর ইসলাম প্রচারের জন্য কোথাও প্রেরণ করতে হলে তাদেরকেই প্রেরণ করা হতো। অর্থাৎ তারা যখন পড়া-লেখা শিখে নেন তখন তাদেরকে ক্বারী আখ্যায়িত করা হতো আর এরপর অন্যদের শিখানোর জন্যও তাদেরকে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে এই সাহাবীদের মধ্য থেকেই অনেকে বড় বড় পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন; অর্থাৎ এই আসহাবে সুফ্‌ফা যারা ছিলেন, এমন নয় যে, তারা সেখানেই বসে ছিলেন, বরং পরবর্তীতে তারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যেমন হযরত উমরের খিলাফতকালে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বাহরাইনের গভর্ণর ছিলেন। এরপর হযরত মুয়াবিয়ার যুগে তিনি মদিনার গভর্ণর হয়েছিলেন। হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস বসরা-র গভর্ণর ছিলেন এবং কুফা শহরের ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন। হযরত সালমান ফারসী মিদিয়ান এর গভর্ণর ছিলেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের কুফা-র গভর্ণর ছিলেন। এরা সবাই আসহাবে সুফ্‌ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উবাদা বিন জাররাহ্ ফিলিস্তিনের গভর্ণর ছিলেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয এর খিলাফতকালে হযরত আনাস বিন মালেক মদিনার গভর্ণর ছিলেন। তাদেরই মধ্য থেকে সেনাপতিও ছিলেন যারা ইসলামের বিজয় অভিযানগুলোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত শুধু সেনাপতিই ছিলেন না বরং হযরত উমরের খিলাফতকালে প্রধান বিচারপতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি দরিদ্র মুহাজেরদের দলের সাথে গিয়ে বসি, অর্থাৎ এই আসহাবে সুফ্‌ফার দলের সাথে, যারা অর্ধ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকার কারণে একে অপরের কাছ থেকে লজ্জাস্থান আড়াল করছিলেন। তাদের প্রায় অর্ধেক শরীর নগ্ন বা পোশাকশূণ্য ছিল, আর এতটাই পোশাকশূণ্য ছিল যে, তারা অতি কষ্টে নিজেদের লজ্জাস্থান আড়াল করছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন ক্বারী পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, এমন সময় মহানবী (সা.) আগমন করেন। মহানবী (সা.) যখন এসে দাঁড়ান তখন ক্বারী নিশ্চুপ হয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) সালাম করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী করছ? আমরা নিবেদন করি যে, এই ক্বারী আমাদের তিলাওয়াত শুনাচ্ছিলেন আর আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব শুনছিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমার উম্মতে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের সাথে আমাকেও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে তারা ধৈর্য ধারণ করছে অনুরূপভাবে তোমাকেও ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহানবী (সা.) আমাদের সাথে বসে পড়েন। নিজ পবিত্র সত্তাকে

আমাদের মাঝে গণ্য করার জন্য তিনি (সা.) তার পবিত্র হাতে বৃত্ত বানিয়ে ইশারা করেন, অর্থাৎ আমিও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, এবং মাঝখানে বসে পড়েন। অতএব সবাই তাঁর (সা.) প্রতি মুখ করে বসে পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হলো আমি ছাড়া তাদের মাঝ থেকে আর কাউকেই মহানবী (সা.) চিনতে পারেন নি। অর্থাৎ তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে অভাবগ্রস্ত মুহাজেরদের দল! তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ। কিয়ামত দিবসে তোমরা পূর্ণ জ্যোতিসহ ধনীদের চেয়ে অর্ধেক দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এই অর্ধেক দিন হবে পাঁচশত বছরের।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতিও এলহাম হয়েছিল যাতে আসহাবে সুফ্ফার উল্লেখ রয়েছে। এটি আরবী এলহাম ছিল যে,

আসহাবু সুফ্ফাতে, ওয়া মা আদরাকা মা আসহাবুস সুফ্ফা। তারা আ'য়ুনাহুম তাফীযু মিনাদ্ দামএ, ইউসাল্লুনা আলায়কা, রাব্বানা ইন্নানা সামে'না মুনাদিয়ান ইউনাদি লিলঈমানে, ওয়া দাঈআন ইলাল্লাহে, ওয়া সিরাজাম মুনীরা।

অর্থাৎ সুফ্ফাবাসীগণ। আর তোমাকে কিসে অবহিত করবে, সুফ্ফাবাসী কারা? তুমি দেখবে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত থাকবে। তারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। আর বলবে, হে আমাদের খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেন। এটি (অর্থাৎ এই এলহাম) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি তাঁর কতিপয় সঙ্গী সম্পর্কে হয়েছিল যে, আমারও এমন সঙ্গী লাভ হবে। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এর যুগে আসহাবে সুফ্ফা যারা ছিলেন তারা অত্যন্ত মর্যাদাবান লোক ছিলেন এবং দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। আর তারা যে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা এক অনন্য উদাহরণ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও অবহিত করেছেন যে, এমন কতিপয় লোক আমি তোমাকেও দান করব।

সহীহ বুখারীতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকায় হযরত উতবা বিন মাসঊদের উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবীদের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত কতিপয় গ্রন্থ রয়েছে, যেমন উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবা, আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা, আল-ইসতিআব ফী মা'রেফাতিল আসহাব এবং তাবাকাতুল কুবরা প্রভৃতি গ্রন্থে উহুদের যুদ্ধ ও এর পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তার অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা উল্লেখ নেই। অপরদিকে ইমাম বুখারী হযরত উতবা বিন মাসঊদকে বদরী সাহাবী হিসবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত উতবা বিন মাসঊদ হযরত উমর বিন খাত্তাবের খিলাফতকালে ২৩ হিজরী সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন আর হযরত উমর (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। কাশেম বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত উতবা বিন মাসঊদের জানাযার নামাযে তার মা হযরত উম্মে আবদের জন্য অপেক্ষা করেছেন যেন তিনিও অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইমাম যুহরীর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (মহানবীর) সাহচর্য ও হিজরতের দিক থেকে তার ভাই হযরত উতবার চেয়ে বেশি প্রবীণ ছিলেন না। অর্থাৎ হযরত উতবা বিন মাসঊদ অধিক প্রবীণ সাহাবী ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা থেকে বর্ণিত, হযরত উতবা বিন মাসঊদ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে পড়ে। কয়েক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কাঁদছেন? তিনি উত্তর দেন, তিনি

আমার ভাই ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ছাড়া বাকি সবার চেয়ে তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-এর কাছে যখন তার ভাই হযরত উতবা বিন মাসঊদের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে তখন তার চোখে অশ্রু নেমে আসে আর তিনি বলেন, **ইন্না হাযিহি রাহমাতুন জাআলাহাল্লাহু লা ইয়ামলিকুহা ইবনু আদামু** অর্থাৎ নিশ্চয় এটি রহমত যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং আদম সন্তান এটিকে নিজের বশে আনতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য। আর পুণ্যবান লোকদের জন্য এটি রহমত হয়ে যায়। এক রেওয়ায়েত মতে, হযরত উমর বিন খাত্তাব হযরত উতবা বিন মাসঊদকে মোকামি আমীর নিযুক্ত করতেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত উবাদা বিন সামেত। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। হযরত উবাদার পিতার নাম ছিল সামেত বিন কায়েস এবং মাতার নাম ছিল কুর্‌রাতুল আইন বিনতে উবাদা। তিনি আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু অউফ বিন খাযরাজ বংশের নেতা ছিলেন যার জন্য তিনি কাওয়াকিল নামে পরিচিত ছিলেন। কাওকাল নামকরণের কারণ হলো, মদিনায় যখন কোন নেতার কাছে কোন ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হতো তখন তাকে বলা হতো, এই পাহাড়ে যেভাবে চাও আরোহন কর, এখন তুমি নিরাপদ অর্থাৎ তোমার কোন ভয় নেই যেখানে যেভাবে ইচ্ছা থাক অর্থাৎ তুমিও নিঃসংকোচ-নির্বিঘ্নে থাক আর এখন কোন জিনিসের ভয় করো না। আর যারা আশ্রয় দিতো তারা কাওয়াকিলা নামে সুপরিচিত ছিল। ইবনে হিশাম বলেন, এমন নেতা যখন কাউকে আশ্রয় দান করতো তখন তাকে একটি তির দিয়ে বলতো, এই তির নিয়ে তুমি এখন যেখানে ইচ্ছে যাও। হযরত নোমানের দাদা সা'লাবা বিন দাদকে কাওকিল বলা হতো। অনুরূপভাবে খাযরাজের নেতা গানাম বিন অউফকেও কাওকিল বলা হতো।

একইভাবে হযরত সাদ বিন উবাদাও কাওকিল উপাধিতে সুবিদিত ছিলেন। বনু সালেম, বনু গানাম এবং বনু অউফ বিন খাযরাজকেও কাওয়াকিলা বলা হতো। বনু অউফের নেতা ছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত। হযরত উবাদার এক পুত্রের নাম ছিল ওলীদ, তার মায়ের নাম ছিল জামীলা বিনতে আবু সা'সা। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল মুহাম্মদ, তার মায়ের নাম ছিল হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান। হযরত অউস বিন সামেত ছিলেন হযরত উবাদার ভাই। হযরত অউসও বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু মারসাদ গানভী যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উবাদার সাথে তার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। হযরত উবাদা বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪ হিজরীতে ফিলিস্তিনের রামলায় মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি বায়তুল মাকদাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই গোরস্থ হন আর তার কবর এখনও সেখানে জানা বা চিহ্নিত রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উবাদা-র মৃত্যু হয় সাইপ্রাসে যখন কিনা তিনি হযরত উমরের পক্ষ থেকে তাদের গভর্ণর হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭২ বছর। তিনি দীর্ঘদেহী এবং স্থুল ও খুব সুশ্রী ছিলেন। কারো কারো মতে তার মৃত্যু হয় পঁয়তাল্লিশ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়ার যুগে, কিন্তু প্রথম উক্তি অধিক সঠিক যেখানে উল্লেখ হয়েছে যে, তার মৃত্যু ফিলিস্তিনে ৩৪ হিজরীতে হয়েছে, ৪৫ হিজরীতে নয়। হযরত উবাদা বিন

সামেত-এর রেওয়ায়েত বা বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৮১-তে গিয়ে পৌঁছে। বিভিন্ন হাদীস তিনি রেওয়ায়েত করেছেন (তার পক্ষ থেকে) যেগুলোর বর্ণনাকারী হলেন, বড় বড় সাহাবী এবং তাবেঈন। অতএব সম্মানিত সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত আনাস বিন মালেক, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত মিকদাম বিন মাদী কারব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উবাদা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর আকাবার রাতে তিনিও নেতাদের মাঝে একজন নেতা ছিলেন। তিনি বলতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চারপাশে তাঁর সাহাবীদের একটি দল ছিল তখন মহানবী (সা.) বলেন, **তোমরা আমার হাতে এই শর্তে বয়াত কর যে, তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, সন্তান হত্যা করবে না আর জেনে-শুনে কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে না, আর কোন ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। অতএব তোমাদের মাঝে যে-ই এই অঙ্গীকার রক্ষা করল, তার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার হাতে ন্যস্ত আর যে-ই সেসব মন্দকর্মের মাঝে কোন একটি করল এবং এ জগতে সে শাস্তি পেয়ে গেল তাহলে এই শাস্তি তার জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে আর যে-ই ঐ মন্দ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কোন একটি করল অথচ আল্লাহ্ তার বিষয়টি গোপন রাখলেন, সেক্ষেত্রে তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ন্যস্ত, আল্লাহ্ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন আবার চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন**। অতএব, আমরা এসব শর্তে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করি। এটি বুখারী শরীফের বর্ণনা।

মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন কুবায় জুমুআর নামায পড়ান তখন নামাযের পর মহানবী (সা.) মদিনায় যাওয়ার জন্য নিজের উটে আরোহন করেন। তিনি (সা.) উটের লাগাম ছেড়ে রাখেন এবং তা আদৌ নাড়েন নি। উটনী ডানে ও বামে এমনভাবে তাকাতে থাকে যেন সে কোন দিকে যাবে সেটির সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। উটনী দাঁড়িয়ে ছিল, সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল না, ডানে-বামে দেখছিল- এটি দেখে বনু সালেমের লোকেরা অর্থাৎ যাদের পাড়ায় মহানবী (সা.) জুমু'আর নামায পড়েছিলেন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করেন। তাদের মাঝে ইতবান বিন মালেক এবং নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন মালেক আর উবাদা বিন সামেতও ছিলেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদের কাছেই অবস্থান করুন। এখানে অর্থাৎ এই এলাকায় লোকসংখ্যাও বেশি আর আপনার সম্মান ও সুরক্ষার বিষয়টিও এখানে নিশ্চিত হবে। আমরা পরিপূর্ণভাবে আপনার সম্মানও করব এবং সুরক্ষার ব্যবস্থাও করব আর এখানে আমাদের মুসলমানদের সংখ্যাও অধিক। অপর এক বর্ণনায় এই শব্দও রয়েছে যে, এখানে ধন-সম্পদও আছে, আমরা বেশ স্বচ্ছল আর আমাদের কাছে অর্থকড়িও রয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে লেখা হয়েছে যে, আমাদের গোত্রে অবস্থান করুন, আমরা সংখ্যায়ও অধিক আর আমাদের কাছে অস্ত্রসস্ত্রও আছে, এছাড়া আমাদের কাছে বাগান এবং জীবনোপকরনও সহজলভ্য। অর্থাৎ আমরা আপনার সুরক্ষাও করতে পারি আর অর্থনৈতিক দিক থেকেও আমরা স্বচ্ছল। এরপর তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! যখন কোন ভীতত্রস্ত আরব এ এলাকায় আসে তখন সে আমাদের এখানে এসেই আশ্রয় অন্বেষণ করে। মহানবী (সা.) তাদের সমস্ত কথা শুনেন আর তাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং বলেন, তোমাদের সব কথাই ঠিক হবে। এরপর বলেন, উটনীর রাস্তা ছেড়ে দাও, কেননা এটি এখন প্রত্যাদিষ্ট, আজ সে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশেই যেখানে যাওয়ার,

দাঁড়ানোর এবং বসার তা করবে। অপর এক বর্ণনায় এই শব্দ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, এই উটনী প্রত্যাদিষ্ট তাই তার পথ ছেড়ে দাও। তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলছিলেন যে, তোমরা যা উপস্থাপন করেছো তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি নিজ কৃপাবারি বর্ষণ করুন। অতঃপর সেই উট সেখান থেকে যাত্রা করে।

মিসর বিজয়ের বিষয়ে সাহাবা চরিতের রচয়িতা লিখেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মিশর জয়ে বিলম্ব হচ্ছিল। হযরত আমর বিন আস আরো সাহায্যের জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পত্র লিখেন। হযরত উমর (রা.) চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন, যার মধ্য থেকে এক হাজার সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন হযরত উবাদা। আর উত্তরে তিনি লিখেন যে, এই সেনা প্রধানদের প্রত্যেকে এক হাজার মানুষের সমান। এই সাহায্য মিশরে পৌঁছলে হযরত আমর বিন আস পুরো সৈন্য বাহিনীকে একত্রিত করে এক জোরালো বক্তৃতা করেন এবং হযরত উবাদাকে ডেকে বলেন, আপনার বর্শা আমাকে দিন আর তিনি স্বয়ং অর্থাৎ হযরত আমর বিন আস নিজের মাথা থেকে নিজের পাগড়ী খুলে ফেলেন এবং বর্শায় গেঁথে তার হাতে তুলে দেন আর বলেন, এটি সেনাপতির পতাকা আর আজকে আপনি হলেন সেনাপতি। এরপর খোদা তা'লার কৃপায় প্রথম আক্রমণেই শহর জয় হয়ে যায়।

হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ দামেস্ক বিজয়ের পর হিমস-এ আসেন আর সেখানকার অধিবাসীরা তার সাথে শান্তিচুক্তি করে। এরপর তিনি হযরত উবাদা বিন সামেত আনসারীকে হিমস-এর গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং নিজে হুমা-র দিকে অগ্রসর হন। হযরত উবাদা বিন সামেত পরবর্তীতে লাযেকিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন যা সিরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী একটি শহর। সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেখানে অনেক বড় একটি দ্বার ছিল যা মানুষের এক বড় দল ছাড়া খোলা যেত না। হযরত উবাদা সৈন্যদেরকে শহর থেকে দূরে নিয়ে যান এবং তাদেরকে এমনসব গর্ত খুঁড়তে নির্দেশ দেন যার মাঝে এক ব্যক্তি এবং তার ঘোড়া ভালোভাবে আত্মগোপন করতে পারে, অর্থাৎ গভীর পরিখা খনন করান। মুসলমানরা আপ্রাণ চেষ্টা করে পরিখা খনন করে আর যখন তারা এই কাজ শেষ করে তখন দিনের আলোয় এটি প্রকাশ পায় যে তারা হিমস-এর দিকে ফিরে যাচ্ছে, আর রাত নেমে এলে নিজেদের ছাউনি এবং পরিখার দিকে ফিরে আসে যা তারা খনন করেছিল। লাযেকিয়ার অধিবাসীরা ধোকায় পড়ে মনে করতে থাকে যে, তারা এদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। সকাল হলে তারা তাদের দ্বার খুলে এবং নিজেদের গবাদি-পশু নিয়ে বের হয়। তখন মুসলমানরা অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করে, যাদের দেখে তারা ভয়ে কেঁপে উঠে। মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে আর সেই দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে এবং তা জয় করে নেয়। হযরত উবাদা দুর্গে প্রবেশ করেন আর তার দেয়ালে চড়েন এবং তার ওপর থেকেই তকবীর দেন। লাযেকিয়ার খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে একটি জাতি ইয়াসিদের দিকে পলায়ন করে, অতঃপর তারা নিরাপত্তা চায় আর বলে, তাদেরকে যেন তাদের ভূমিতে ফিরে আসতে দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রথমে তারা ভয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে তারা বলে যে, আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমরা ফিরে আসতে চাই। অতএব খাজনা আদায়ের শর্তে জমি তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় যে, তোমরা আয়ের একটি অংশ প্রদান করবে। এই বলে তাদেরকে তাদের জমি ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং যেখানে তারা উপাসনা করতো তাদের সেই উপাসনাস্থলও এই বলে তাদের জন্য ছেড়ে দেয়া হয় যে,

ঠিক আছে যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের উপাসনা করতে পার। মুসলমানরা লাযেকিয়ায় হযরত উবাদা-র নির্দেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যা পরবর্তীতে আরো সম্প্রসারিত করা হয়। হযরত উবাদা এবং মুসলমানগণ সমুদ্র-তীরে পৌঁছেন এবং বলদা নামক একটি শহর জয় করেন, যা জাবালা দুর্গ থেকে দুই ফারসাখ অর্থাৎ ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উবাদা এবং তার মুসলমান সাথীগণ এরপর ইনতার্তুস জয় করেন যা সিরিয়ায় সমুদ্র-তীরে অবস্থিত একটি শহর, তাদের মাধ্যমে বহু বিজয় অর্জিত হয়েছে। একইভাবে সিরিয়ার লাযেকিয়া, জাবালা, বালদা, ইনতার্তুস স্থানসমূহ হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর হাতেই জয় হয়।

একবার মহানবী (সা.) হযরত উবাদা (রা.)-কে কিছু যাকাতের সম্পদের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাকে নসীহত করেন যে, আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বদা ভয় করবে। এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন উটকে তোমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে আনতে হয় আর তা ক্রন্দনরত থাকবে। অথবা ছাগল তোমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে আনতে হয় আর তা মেঁ মেঁ শব্দ করতে থাকবে; অর্থাৎ কোথাও খিয়ানত যেন না হয়। এমন যেন না হয় যে, তুমি সদকাগুলোর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। সে যুগে সদকা হিসেবে উট, গাভী, বকরী প্রভৃতি আসতো, এমন যেন না হয় যে, যাকাত কিংবা সদকা হিসেবে আসা এই জিনিসগুলো তুমি সঠিকভাবে বণ্টন এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে না। তাহলে কিয়ামতের দিন সেগুলোই তোমার জন্য বোঝা হয়ে যাবে। এ কথা শুনে হযরত উবাদা বিন সামেত বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে (সা.) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তো দুইজন ব্যক্তির দায়িত্বও গ্রহণ করব না। আমার অবস্থা এরূপ যে, আমি কারো কোন বোঝা সহ্য করতে পারবো না। তাই আমাকে এ দায়িত্ব প্রদান না করলে ভালো হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে আনসারদের মধ্য থেকে পাঁচ ব্যক্তি কুরআন একত্রিত করেছিলেন যাদের নাম হলো:

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত আবুআইউব আনসারী (রা.) এবং হযরত আবু দারদা (রা.)।

হযরত ইয়াযিদ বিন সুফিয়ান (রা.) সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত উমর (রা.)-কে লিখেন, সিরিয়াবাসীর জন্য এমন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তাদেরকে কুরআন শিখাবেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান দান করবেন। হযরত উমর (রা.) হযরত মুআয, হযরত উবাদা এবং হযরত আবু দারদা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত উবাদা (রা.) ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করেন। হযরত জানাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি যখন হযরত উবাদা (রা.)-র কাছে পৌঁছি তখন আমি তাকে যে অবস্থায় পেয়েছি তা হলো, তিনি আল্লাহ্‌র ধর্মকে খুব ভালোভাবে বুঝতেন অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মুসলমানরা যখন সিরিয়া বিজয় করে তখন হযরত উমর (রা.) হযরত উবাদা এবং তার সাথী হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আবু দারদা (রা.)-কে সিরিয়াবাসীদের কুরআন শিখানো এবং ধর্মীয় জ্ঞান দানের জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেন। হযরত উবাদা (রা.) হিমস-এ অবস্থান করেন আর হযরত আবু

দারদা (রা.) দামেস্ক-এ অবস্থান করেন এবং হযরত মুআয (রা.) ফিলিস্তিনের দিকে চলে যান। কিছুকাল পরে হযরত উবাদা (রা.)ও ফিলিস্তিনে চলে যান। সেখানে আমীর মুআবিয়া একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ করে যা হযরত উবাদা (রা.) অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ ছিল। আমীর মুআবিয়া সেই বিষয় নিয়ে তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলেন যার উত্তরে হযরত উবাদা (রা.) বলেন, আমি কখনোই আপনার সাথে একস্থানে থাকবো না। অতঃপর তিনি মদিনা চলে যান। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এখানে আসার কারণ কী? তখন হযরত উবাদা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন যে, এভাবে মতভেদ হয়েছিল, তিনি আমার সাথে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় কথা বলেছেন। যাহোক মতবিরোধের কারণে তিনি ফিরে আসেন। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি নিজের জায়গায় ফিরে যাও আর আল্লাহ্ তা'লা এমন ভূমিকে নষ্ট করে দিবেন যেখানে তুমি অথবা তোমার মতো অন্য কেউ থাকবে না অর্থাৎ জ্ঞানী, ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, মহানবী (সা.)-এর পুরনো সাহাবীদের মধ্য থেকে অবশ্যই কারো সেখানে থাকা উচিত। নয়তো এটি সেই ভূমির দুর্ভাগ্য। তাই তোমার ফেরত যাওয়া প্রয়োজন আর আমীর মুআবিয়াকে এই আজ্ঞা লিখে পাঠান যে, হযরত উবাদা-র উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই। কিছু বিষয় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে যদি তিনি কিছু বর্ণনা করেন বা কোন কথা বলেন, তা শুনবে। আর তিনি যা বলেন তা সঠিক। যাহোক, হযরত উবাদা সম্পর্কে আরও অনেক কথা এবং রেওয়ায়েত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী খুতবায় তুলে ধরা হবে, কারণ তা অনেক দীর্ঘ ও বিস্তারিত বর্ণনা; এর জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হবে।

এখন আমি একজন প্রয়াত মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। আমি তার জানাযাও পড়াব, এটি উপস্থিত জানাযা। তিনি হলেন মোকাররম তাহের আরেফ সাহেব, যিনি ঐশী তকদীরের অধীনে গত ২৬ আগস্ট তারিখে অত্যন্ত ধৈর্য সাপেক্ষ অসুস্থতার পর যুক্তরাজ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার ক্যান্সার ছিল এবং তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করেছেন। তিনি পূর্বে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন; এরপর সম্প্রতি কয়েক বছর পূর্বে আমি তাকে ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি নিযুক্ত করেছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ইদানীং ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি ছিলেন এবং ধর্মসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। মোকাররম তাহের আরেফ সাহেব ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পরিবার মূলত শিয়ালকোটের অধিবাসী ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে তারা সারগোধায় এসে বসবাস শুরু করেন। মোকাররম তাহের আরেফ সাহেবের পিতা মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামাতের মুবাল্লেগ ছিলেন, যিনি মুবাল্লেগ হিসেবে ইংল্যান্ডে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব লন্ডন মসজিদের নায়েব ইমামও ছিলেন, রাবওয়ায় তাহরিকে জাদীদের নায়েব ওয়াকিলুত্ তবশিরও ছিলেন। মোকাররম মওলানা মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামা'তের শীর্ষস্থানীয় তার্কিক ও বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের যে সমাবেশে পাকিস্তান

সংক্রান্ত রেজোলুশন অনুমোদিত হয়, তাতে হযরত মওলানা আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেবের সাথে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিনিধি হিসেবে মোকাররম মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেবও অংশ নিয়েছিলেন; অর্থাৎ তাহের আরেফ সাহেবের পিতা। যাহোক, এভাবে তিনি ঐতিহাসিক এক সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাহের আরেফ সাহেবের মাতা ছিলেন মোহতরমা ইনায়েত সুরাইয়া বেগম সাহেবা। আর তার দাদা হযরত চৌধুরী গোলাম হোসেন ভাট্টি সাহেব সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তাহের আরেফ সাহেব খুব জ্ঞানপিপাসু ও জ্ঞানসন্ধানী মানুষ ছিলেন, আর বড় পারদর্শী সাহিত্যিকও ছিলেন এবং কবিও ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেছেন। তার দু'টি কবিতার সংকলন প্রসিদ্ধ, একটি হলো উর্দু ভাষার এবং একটি পাঞ্জাবী ভাষার।

এছাড়া তার আরও দু'টি বিখ্যাত বই রয়েছে; মহানবী (সা.) সম্পর্কে তিনি ইংরেজিতে একটি বই লিখেছেন, নাম 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', আরেকটি বইয়ের নাম হলো 'পাকিস্তান মঞ্জিল বামঞ্জিল' (পাকিস্তান ধাপে ধাপে), এটি তার দ্বিতীয় বই। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ করার পর সেখান থেকেই এল.এল.বি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে চলে আসেন। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে এল.এল.এম ডিগ্রি অর্জন করেন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মার্ক অব মেরিট' সম্মাননাও লাভ করেন। লন্ডনে পড়ালেখা শেষ করে পাকিস্তানে চলে আসেন আর এখানে সি.এস.এস পরীক্ষা পাস করেন এবং পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যুক্ত হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উন্নতি করতে করতে পুলিশের মহাপরিদর্শক বা আইজি পদ পর্যন্ত পৌঁছেন। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্থাৎ আমাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ের পর পাকিস্তানে যে অবস্থা হয়েছিল, সেই সময়ে তার এই পদে পৌঁছা নিঃসন্দেহে তার অসাধারণ যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করে। পাকিস্তান পুলিশ ছাড়া তিনি এফ.আই.এ এবং ইমিগ্রেশন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে চৌধুরী রশিদ সাহেব শিশুদের জন্য ইংরেজিতে যেসব পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছিলেন, সেসব পুস্তকাদি লেখার ক্ষেত্রেও তিনি সহযোগিতা করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং অনেক কাজ করেছেন।

আল্লাহ তা'লার কৃপায় তার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার অনেক আগ্রহ ছিল আর অভ্যাসজনিতভাবে নিয়মিত তিনি কোন না কোন পুস্তক পাঠ করতেন। আর কেবল পাঠই করতেন না বরং রীতিমত নোট নিতেন এবং নিজ বন্ধুদের সাথে সেগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে মতবিনিময়ও করতেন। নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এতে প্রণিধান করতেন। তার কোন আত্মীয়-স্বজন এ কথা লিখেন নি কিন্তু কথায় কথায় একবার তার উল্লেখ হলে আমি জানতে পারি যে, তিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি পাকিস্তানের যেখানেই অবস্থান করেছেন সর্বদা জামা'তের কাজে অংশ নিতেন। অত্যন্ত নির্ভিক মানুষ ছিলেন। খোদা তা'লার অনুগ্রহে, আমি যেমনটি বলেছি, তার পড়াশুনার গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল এবং মেধাবী ছিলেন। তাই তার ধর্মীয় ও জাগতিক পড়াশুনা ছিল ব্যাপক এবং জ্ঞানের যথোপযুক্ত ব্যবহার করতেন আর জামা'তের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি খুব ভালো মতামত রাখতে, একজন সঠিক পরামর্শদাতা ছিলেন। খিলাফতে

আহমদীয়ার জন্য অত্যন্ত আত্মাভিমানী ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান এবং নির্ভীক আহমদী ছিলেন। সারাটি জীবন খিলাফতে আহমদীয়ার সুলতানে নাসীর হয়ে থাকার এবং জামা'তের একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি দেখেছি যে, তার এই প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে সফলও করেছেন। তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে আমি তাকে জানি। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেই সময় থেকেই তার জ্ঞান আহরনের অনেক একাগ্রতা ছিল। তিনি একজন ভালো তার্কিকও ছিলেন। কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। একজন ভালো বক্তাও ছিলেন। আর আমি দেখেছি যে, সে সময়েও তার যথেষ্ট ধর্মীয় জ্ঞান ছিল। এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি মনে-প্রাণে জামা'তের সেবক এবং ওয়াকেফিনে জিন্দেগীদের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার চেতনা রাখতেন। এছাড়া আহমদী বন্ধুদের বৈধ সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। অত্যন্ত উচ্চপদে আসীন ছিলেন এদিক থেকে তিনি নিজ আহমদী ভাইদের বৈধভাবে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন।

২০১৪ সাল থেকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনে তাঁর সেবাকাল আরম্ভ হয় যখন আমি তাকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। এরপর ২০১৭ সালে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের তৎকালীন সদর চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তাকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সদর হিসেবে নিযুক্ত করি আর যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি আমৃত্যু ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সদর ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে ইংল্যান্ডে চিকিৎসার জন্য আসার তিন চার মাস পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত কষ্ট করে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের কাজ সম্পাদন করতেন। সকল মিটিংয়ে নিয়মিত অত্যন্ত আগ্রহের সাথে যোগদান করতেন। তাঁর যুগে কাজের পরিধি বেশ বিস্তৃত হয়েছে।

তার শোক সন্তপ্ত পরিবার হিসেবে তার স্ত্রী আনিসা তাহের সাহেবা, বড় ছেলে আসফান্দ ইয়ার আরেফ এবং তিন মেয়ে তাইয়্যেবা আরেফ, আযীযা অওজ ও বিনা তাহের আরেফকে রেখে গেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং এক ছেলে ও এক মেয়ের বিয়ে এখনো হয় নি। তার মেয়ে তাইয়্যেবা আরেফ তাহের সাহেবা লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পিতা মোহতরম তাহের আরেফ সাহেব মরহুমকে প্রভূত পার্থিব উন্নতি দান করেছেন কিন্তু তিনি সর্বদা আহমদীয়াতের পরিচিতিকে অত্যন্ত বীরত্ব এবং আত্মাভিমানের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। একান্ত বিশ্বস্ত এবং আস্থাশীল কর্মকর্তা ছিলেন। ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাবান, অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, উচ্চমানের ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী, একজন দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন, নিতান্তই স্নেহবৎসল পিতা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি খোদা তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসায় মগ্ন ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের মা বলেন, তিনি তাকে সর্বদা ন্যায়পরায়ণ এবং নরম স্বভাবের মানুষ হিসেবে পেয়েছেন। নিজ পদের ঊর্ধ্বে গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কোন কোন আত্মীয়-স্বজন আবেগের বশবর্তী হয়ে এবং সম্পর্কের কারণে অনেক কথাই লিখে থাকে কিন্তু আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, তার সম্পর্কে যা-ই লিখা হয়েছে তার সবই সত্য। তিনি বাস্তবেই এমন ছিলেন।

মোবারক সিদ্দীকি সাহেব লিখেন, মরহুম তাহের আরেফ সাহেবের স্বভাবের মাঝে বিনয় ও নম্রতা ছিল এবং যুগ খলীফার সাথে গভীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। তিনি একজন উচ্চ মানের কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার তাকে নিজের পছন্দের কোন কবিতা শোনাতে বলি। তিনি তখন খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার এই পঙ্‌ক্তিটি শোনান:

হে মনিব! তোমার গোলাম যদি কখনো তোমার পাশে থাকে
তাহলে আমার দেহ যেন ঘাসের মতো তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, একদিন এক বন্ধুভাবাপন্ন বৈঠকে আমি বলি, তাহের সাহেব! আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে কোন না কোনভাবে অনেক সম্মানে ভূষিত করেছেন। আপনি পুলিশ বিভাগে অনেক বড় পদে কাজ করার সম্মান লাভ করেছেন। তিনি বলেন, এর চেয়ে অনেক বড় সম্মান হচ্ছে আমি আহমদী। এরপর তিনি আমার সাথে লেখাপড়া করার উল্লেখ করে বলেন যে, আমি যুগ খলীফার সহপাঠীও ছিলাম। এটি আমার জন্য অনেক বড় সম্মান। তার পিতা মোহতরম মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তাকে রাবওয়ার কলেজে ভর্তি করেছিলেন। যেহেতু এর কিছুদিন পরই আমাদের কলেজ জাতীয়করণ করে নেয়া হয়েছিল, তাই হোস্টেলে থাকার পরিবর্তে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের সাথে যেহেতু মওলানা মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেবের খুব আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, তাই তিনি তখন দারুয্ যিয়াফতে তার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন আর সেখানে থেকেই তিনি তার পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবনে অকৃত্রিমভাবে অনেক কথা হয়ে যায়, হাসিঠাট্টা হয়। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন, তখন থেকেই তিনি আমার সাথে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ আরম্ভ করেন আর খিলাফতের আসনে আসীন হবার পর তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরও পূর্ণ বিস্বস্ততার সাথে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। তার বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়-স্বজনরাও বিভিন্ন ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি খুবই বিনয়ী, নম্র ও জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।

এখন নামাযের পর আমি তার জানাযা পড়াব, এটি উপস্থিত জানাযা, তাই নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব, বন্ধুগণ জানাযার জন্য এখানেই সারিবদ্ধ হবেন।